শের-ই-বাংলা: জীবন ও কর্ম

প্রণয়ন ও সংকলন

প্রফেসর মো. মোসলেম উদ্দীন শিকদার

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম

Academia Publishing House Ltd

অভিমত

শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক ও তাঁর পৈতৃক জেলা বরিশালের আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষক, চাখার ফজলুল হক কলেজ ও গৌরনদী সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ এবং চট্রগ্রাম কলেজের ইতিহাসের প্রফেসর মো. মোসলেম উদ্দীন শিকদার কর্তৃক 'শের-ই-বাংলা: জীবন ও কর্ম' শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়নের এই শুভ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

শের-ই-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের কিংবদন্তিতুল্য মহানায়ক, এক প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি একাধারে অনন্যসাধারণ বাগ্মী, তুখোড় আইনজীবী, প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ এবং অতুলনীয় জনদরদী ও দানশীল ছিলেন। রাজনীতিবিদ, শিক্ষানুরাগী ও সমাজসংস্কারক হিসেবে তিনি বাংলার গণমানুষের হৃদয়ের গভীরে আসন করে নিয়েছেন। তাইতো তাঁর মহাপ্রয়াণের অর্ধশতক গত হলেও শের-ই-বাংলার সুনাম সুখ্যাতি এতটুকু কমেনি। বাঙালি মুসলিম সমাজ বিনির্মাণে, মুসলিম জাতিসত্তা বিকাশে এবং ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের প্রণেতা ও উত্থাপক হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পশ্চাতে এ মহান নেতার অবদান অবিস্মরণীয়। উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারির মালিক হলেও তিনি সামন্তপ্রথা ধ্বংসপূর্বক 'লাঙ্গল যার, জমি তার' এর ভিত্তিতে এদেশের তৎকালীন ৮৫% কৃষককে জমির মালিকানা প্রদান ও তাদের যাবতীয় ঋণ মওকুফপূর্বক আধমরা চাষিদের নতুন জীবন দান করেন। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানেও তাঁর ভূমিকা অসামান্য।

জাতির ক্রান্তিলগ্নে আবির্ভূত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের জীবনগাথায় শুধু তাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না; একই সাথে পাঠক চিত্তে সৃষ্টি করে তাঁর সমকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস। প্রজন্ম তথা জাতি লাভ করে চলার পথের দিকনির্দেশনা। 'শের-ই-বাংলা: জীবন ও কর্ম' শীর্ষক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন না করেও শুধু গ্রন্থকারের দুটি কথা, সূচি ও পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ পাঠ থেকে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, উল্লেখিত বিষয়ে নিবেদিতপ্রাণ লেখক অবিভক্ত বাংলায় যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত, বঞ্চিত, ইংরেজ-হিন্দুর জাঁতাকলে পিষ্ট পাশ্চাৎপদ মুসলমান ও নমশুদ্রদেরকে

বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করতে শের-ই-বাংলা যে নিরলস সংগ্রাম করেছেন, তার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা তথা মূল্যায়নে তিনি চেষ্টার কোনো কসুর করেননি।

আমি আরও জেনে আনন্দবোধ করছি যে, শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হককে যিনি নিকট থেকে জেনেছেন, যার পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতা করেছেন, সেই কবি এ কে জয়নুল আবেদিন (১৯২০-৮০) সংকলিত ও সম্পাদিত 'মেমোরেবল স্পীসেস অব শের-ই-বাংলা' শীর্ষক দুর্লভ গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদের মহতী কাজেও অধ্যাপক শিকদার হাত দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, অধ্যক্ষ শিকদার শের-ই বাংলার পৈতৃক পল্লি চাখারের বাসিন্দা, চাখার ফজলুল হক কলেজের কৃতিছাত্র ও পরবর্তী কালে ঐ কলেজে অধ্যাপনা করার সুবাদে চাখার শের-ই-বাংলা স্মৃতি জাদুঘরসহ মহান নেতার স্মৃতিমণ্ডিত অনেক কিছুর তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। আমি তাঁর এসব গবেষণামূলক রচনার উদ্যোগকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

সবশেষে, আমাদের বর্তমান প্রজন্ম শের-ই-বাংলার জীবনাদর্শকে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের বসবাসযোগ্য দুর্নীতি ও আগ্রাসনমুক্ত সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার দীপ্ত শপথ নিয়ে এগিয়ে যাক, মহান নেতার জন্য জান্নাত নসিব হোক, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আমরা এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী
সাবেক মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি
এবং
সাবেক চেয়ারম্যান, বাসস, ঢাকা

তারিখ: ১৪/০৭/২০০৭ ইং

ধানমন্ডি, ঢাকা

গ্রন্থকারের দুটি কথা

অনন্য সাধারণ প্রতিভার প্রদীপ্ত ভাস্কর, বঙ্গ ভারতের কিংবদন্তিতুল্য জননায়ক, অবিভক্ত বাংলার সফল প্রধানমন্ত্রী, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের প্রণেতা ও উত্থাপক হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বাপ্নিক ও অন্যতম স্থপতি, শের-ই-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক একটি সার্থক জীবন, একটি ঘটনাবহুল শতাব্দী, একটি জীবন্ত ইতিহাসের নাম। তাঁর ষাট বছরের কর্মবহুল জীবনের সিংহভাগ কেটেছে কলকাতায়, যে কলকাতা কর্পোরেশনের তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম মেয়র। পাকিস্তান প্রস্তাবের অবিসংবাদিত উত্থাপক, পাকিস্তানের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানের প্রথম লিখিত সংবিধান প্রণেতা, আর বর্তমান বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বাঙালি গভর্নর শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক এদেশের আপামর জনসাধারণের কাছ থেকে মহাপ্রয়াণের প্রায় অর্ধশতক পরেও মনে হয় জীবন্ত ও সবচেয়ে জনপ্রিয় শ্রদ্ধাভাজন নেতা। কিন্তু পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনো সরকার কিংবা সংস্থা কর্তৃক শের-ই-বাংলার বহুমুখী অবদান ও কৃতিত্বের সঠিক মূল্যায়ন কি হয়েছে? এ মহান নেতার একখানা জীবনীগ্রন্থ পরিকল্পিতভাবে লেখা হয়েছে বলে জানা নেই। একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক বিদগ্ধ প্রফেসর আপা লেখককে দুঃখের সাথে বললেন: প্রতি বছর ২৬ অক্টোবর জন্মদিনে না হলেও ২৭ এপ্রিল শের-ই-বাংলার মৃত্যুবার্ষিকীতে সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়নি কেন? অন্তত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা হওয়া উচিত। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে শের-ই-বাংলার অসামান্য অবদান অবিস্মরণীয়। অথচ বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশই সেই ইতিহাস জানে না।

পরম বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় যে, একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে জাতির নতুন প্রজন্মকে তাদের সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ রাখা হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের ভূত বিভাগোত্তর (১৯৪৭) কালের পাকিস্তানি শাসকদের ঘাড়েও সওয়ার হয়েছিল। পাকিস্তান কী কারণে সৃষ্টি হয়েছিল, এর আদর্শিক পটভূমি ও ভিত্তি কী ছিল, কেন দীর্ঘ সাত বছর (১৯৪০-৪৭) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহসহ পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দ শুধু নন, অবিভক্ত

বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পর্যন্ত নিরলস ও আপোষহীনভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন। কেন লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি (ভারত) ছেড়ে ফিলিস্তিনি ও রোহিঙ্গাদের ন্যায় ছিন্নমূল হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। আর কতকাল আমরা সেই আপ্তবাক্য আওড়াবো,'ইতিহাসের বড় শিক্ষা, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।'

১৭৫৭ সাল থেকে ব্রিটিশ শাসনকে ঘিরেই হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় পার্থক্য তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের স্তরে স্তরে প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজ শাসকগণ ভাবলেন, মুসলমানরা তাদের পরাজিত শত্রু, তাই তারা মনেপ্রাণে ব্রিটিশবিরোধী। এই মনোভাব নিয়েই তাঁরা দীর্ঘকাল মুসলমানদের আর্থসামাজিক উন্নতির ব্যাপারে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। হিন্দুরা মুসলমানদের বহিরাগত ও দখলদার ভেবে তাদেরকে ভালো চোখে দেখতো না। তারা ইংরেজ শাসনকে কেবল প্রভু ও প্রভুত্বের পরিবর্তন মনে করত। হিন্দুদের এ মন মানসিকতার জন্য প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা লেলিনের সহযোদ্ধা ড. মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো মুষ্টিমেয় হিন্দু পণ্ডিত ও নেতারা অবশ্য দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। (ড. এম. এন. রায়, ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই (ঢা.বি) অনূদিত, বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত)

১৭৫৭ সালে পলাশীতে মুসলমানদের হাত থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার মাধ্যমে ইংরেজ বেনিয়া কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কব্জা করার পরে এদেশের হিন্দুরা নব্য শাসকদের সাথে সহযোগিতা এমনকি মিত্রতা করলেও মুসলমানরা ১৮৫৭ পর্যন্ত একটানা আপোষহীন সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। সংগত কারণে সেই ইতিহাস এখানে আলোচনা করা সম্ভবপর হলো না। ইঙ্গ-হিন্দুর যৌথ ষড়যন্ত্র ও জাঁতাকলে পিষ্ট হয় ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতীয় মুসলমানদের যখন নাভিশ্বাস, সাহসী ও সুযোগ্য নেতার অভাবে যখন তারা দিশেহারা, তখন তাদের মুক্তির দিশারীরূপে আবির্ভূত হলেন শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)। জাতির এ ঘোর দুর্দিনে তাদের চরম দুর্দশা ও দুঃখ-কষ্টে ফজলুল হকের কোমল হৃদয় ব্যথিত

ও উদ্‌গ্রীব করে তুলল। উচ্চ সরকারি চাকরির মোহ, পারিবারিক জীবনের সচ্ছল ভবিষ্যৎ ও ব্যক্তিগত জীবনের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে মজলুম মুসলমানের খিদমত, হিন্দুদের কারণে কোণঠাসা ও পশ্চাৎপদ মুসলমানদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন উদীয়মান তরুণ তেজস্বী নেতা অ্যাডভোকেট এ কে ফজলুল হক।

ফজলুল হক কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কিন্তু পদে পদে তাঁকে বহুবিধ বাধাবিপত্তি মোকাবিলা করতে হলো। অনুন্নত ও অবহেলিত মুসলমানদের স্বার্থোদ্ধার করতে গিয়ে কায়েমি স্বার্থহানির আশঙ্কায় হিন্দু ও ইংরেজগণ ফজলুল হকের বিরোধিতা করতে লাগল। কিন্তু ফজলুল হকের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, ইস্পাত কঠিন মনোবল, নিঃস্বার্থ ত্যাগ-কুরবানি, অপরিসীম সাহসিকতা সব প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে বাঙালি মুসলিম সমাজকে শতাব্দীর শৃঙ্খলমুক্ত করে মনজিলে মকসুদে পৌঁছে দেয়।

অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতের সবখানে অধঃপতিত মুসলমান ও অবহেলিত নমশুদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত সমুন্নত রাখতে শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হককে কম সমালোচনা ও নিন্দার মোকাবিলা করতে হয়নি। এজন্য তিনি আঁতুড়ঘর থেকে (১৯০৬) প্রতিপালিত মুসলিম লীগের চোখেও কখনো ছিলেন ভারতের দালাল 'ট্রেইটর' আবার কংগ্রেস কিংবা বর্ণ হিন্দুর চোখে ছিলেন সাম্প্রদায়িক। অথচ তাঁর চেয়ে অসাম্প্রদায়িক আর কোনো শীর্ষ নেতা ছিলেন কি?

শের-ই-বাংলার জীবদ্দশায় অনেকে এমনকি নিজ দলীয় ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতারা পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বাস্তবতা অনুধাবন করতে না পেরে সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু শের-ই-বাংলা ছিলেন দৃঢ়চিত্ত, নির্ভীক ও প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ। প্রখর ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন শের-ই-বাংলা উপমহাদেশের অবিসংবাদিত মুসলিম লীগ নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) কর্তৃক কোনো একটা ব্যাপারে কৈফিয়ত তলবে তাঁকে পাল্টা কৈফিয়ত তলবপূর্বক প্রত্যুত্তর দিলেন, 'আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বর্তমান ভারতের যেকোনো মুসলিম লীগ নেতা থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠ। বর্তমানে যারা নেতৃত্বভার

গ্রহণ করেছে, তাদের রাজনীতিতে প্রবেশের বহু আগেই লীগের নেতৃবর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা লাভ করেছিলাম'। স্মর্তব্য, ইতিপূর্বে অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী হিসেবে ইংরেজ গভর্নর মি. হার্বাটকে কঠোর ভাষার সমালোচনা করতে ফজলুল হক কুণ্ঠাবোধ করেননি। (দেখুন বিভাগ পূর্বকালে প্রণীত তাঁর 'বেঙ্গল টু-ডে, ১৯৪৪ শীর্ষক ঐতিহাসিক পুস্তিকা)

১৯০৬ সালের শেষ দিনগুলোতে ঢাকার শাহবাগে নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছিল, ফজলুল হক তা দ্বারা সারাজীবন প্রভাবিত হয়েছেন। বাকেরগঞ্জ জেলার (বর্তমানে বরিশাল বিভাগে) সবচেয়ে প্রাচীন মুসলিম ঐতিহ্যবাহী এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ধর্মপ্রাণ সন্তান হিসেবে আপন ইতিহাস ও উত্তরাধিকার চেতনা শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল ক্রিয়াশীল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অরাজক শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর আদর্শ আইনজীবী পিতা ও পিতামহের। ১৮৫৭-এর স্বাধীনতা বিপ্লবের চেতনায় তাঁরা যেমন উজ্জীবিত ছিলেন, তেমনি পরবর্তীকালে এর ব্যর্থতার গ্লানিও সমাজের অন্য সব নেতার মতো তাঁদের বয়ে বেড়াতে হয়েছে। অতীতের এ যন্ত্রণার স্মৃতি স্বাভাবিকভাবেই রেখাপাত করে যুবক ফজলুল হকের মন ও মানসে। তাঁর মধ্যে পাশাপাশি ও পর্যায়ক্রমে সমাবেশ দেখা যায় ফকির মজনু শাহের বৈপ্লবিক চেতনায়, হাজী শরিয়তুল্লাহর সামন্ত শোষণবিরোধী গণসংগঠন শক্তির, শহীদ তিতুমীরের আপোষহীন সংগ্রাম ও অমিত স্বাধীনতা প্রীতির, নবাব আবদুল লতিফ ও নবাব সলিমুল্লাহর শিক্ষা ও সমাজসংস্কার প্রতিভার এবং সৈয়দ আমীর আলীর জাতীয় ইতিহাস সচেতনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের। এ কে ফজলুল হকের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, তাঁর সংগ্রাম এবং সাধনার গভীরে দৃষ্টিপাত করলে এইসব ঐতিহাসিক প্রভাব, সততা ও যোগ্যতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম এবং দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত থেকেও দরিদ্র, শোষিত ও পশ্চাৎপদ মানুষের প্রতি ছিল তাঁর সহজাত ও সহমর্মিতাবোধ; যার উন্মেষ ঘটেছিল তাঁর পারিবারিক আদর্শ ও ঐতিহ্যের সন্ধানে।

বিগত শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলা, ভারত উপমহাদেশ ও পাকিস্তানের ইতিহাসে সংঘটিত প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ কে

ফজলুল হক জড়িত এবং বেশকিছু ক্ষেত্রে বিতর্কিত বটে। তাঁর একেবারে সমসাময়িক না হয়েও বয়োকনিষ্ঠ সহকর্মী প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক, সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সাংবাদিক অলি আহাদ প্রমুখ তাদের স্ব-স্ব স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে অনেক আলোচনা সমালোচনা করেছেন। এ কে ফজলুল হক সম্পর্কে সাধারণ একটা অভিযোগ, তিনি গদির লোভে বারবার দল কিংবা মত পরিবর্তন করেছেন । কিন্তু শের-ই-বাংলার সাথে সমসাময়িক অধিকাংশ নেতার তফাত এখানেই যে, অনেকেই এক-আধবার ক্ষমতায় গিয়ে চৌদ্দপুরুষ বসে খাওয়ার অলীক আশায় অবৈধ পন্থায় দেশে-বিদেশে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন; আর ফজলুল হক সারা জিন্দেগি মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, লাটগিরি এবং যুগশ্রেষ্ঠ আইনজিবী হয়েও পৈত্রিক জমিদারির উত্তরাধিকারীর সম্পদটুকুও জমিয়ে রাখেননি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আমরণ বাস করতে অনধিক পাঁচ হাজার টাকায় ক্রীত কে এম দাস লেনের বাড়িটুকুই তো ছিল শেষ সম্বল।

শের-ই-বাংলার একটা উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করার সময় এসেছে বোধ করি: 'জীবনে স্বার্থান্ধ মানুষ আমাকে ভুল বুঝতে পারে। কারণ, আমি যা দেখছি তারা তা দেখতে পাবে অনেক পরে। মরণের পরে তারা আমাকে ভুল বুঝবে না, গাড়ি বোঝাই করে ফুল ঢালবে আমার কবরে'। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. মফিজুল্লাহ কবীরের (১৯২৫-৮৬) ১৯৭৭ সালের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য: "Recently there has been a certain awakening among a Section of our intelligentsia on the importance of studies on Fazlul Huq. Bangladesh owes most to him for what it is today" (Source: Foreword of Memorable Speeches of Shere Bangla, Edited by Poet A. K. Joynul Abedin Al- Helal Publications Barishal, 1978)

শের-ই-বাংলা ছিলেন অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কালের জীবন্ত ইতিহাস, তাঁর নিজের ভাষায় 'বাংলার বোবা ইতিহাস'। তাঁর ইন্তিকালের পরেও প্রায় অর্ধ শতক গত হলেও ইতিমধ্যে দলীয় রাজনীতি কিংবা সাময়িকভাবে বিপুল

সাড়া ও সমর্থন নিয়ে অনেক নেতা গতায়ু হয়েছেন। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে আত্মজিজ্ঞাসাপূর্বক বলুন, 'শের ই-বাংলার মতো সৎ, যোগ্য, দেশপ্রেমিক ও দুর্নীতিমুক্ত নেতার শূন্যস্থান কি পূরণ হয়েছে?'

শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার স্বপ্ন দেখেছেন, যা হবে সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও যাবতীয় আধিপত্যবাদের কবলমুক্ত। যে দেশ পরিচালিত হবে নিজস্ব নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা, যারা জনসাধারণ ও তাদের মতামতের প্রতি থাকবে শ্রদ্ধাশীল, যারা নিজেদেরকে জানবে জনগণের বন্ধুসেবক হিসেবে, প্রভু বা ত্রাণকর্তা নয়। যারা জন্মভূমিকে ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ মনে করেন, যেকোনো বিপদআপদে এদেশের মাটি আঁকড়ে থাকবে, যারা যেকোনো অজুহাতে বিদেশি হস্তক্ষেপ কামনার পরিবর্তে নিজেরাই (জনগণের ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ থাকলে তো কথাই নেই) পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান চান, তাদের পক্ষেই সম্ভব শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের মতো পরিকল্পিত ও প্রত্যাশিত সুখী, সমৃদ্ধশালী গণতান্ত্রিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করা। স্বাধীনতার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির পর্যালোচনার আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৯৮১ সালের ২৭ এপ্রিল শের-ই-বাংলা জাতীয় স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে শের-ই-বাংলার মাজার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইতিহাস) বিভাগীয় চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৬৬-৭১) ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ইতিহাসবিদ ড. মফিজুল্লাহ কবির তাঁর ভাষণের শেষ পর্যায়ে বলেন: 'এই উপলক্ষে আমরা প্রতিজ্ঞা করি, আমাদের মহান জাতীয় নেতা শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের একটি তথ্যভিত্তিক জীবনী রচনা করতে হবে, বিভিন্ন সময় তিনি যেসব ভাষণ দিয়েছেন তার একটি সংকলন প্রকাশ করতে হবে এবং এই সমস্তের ভিত্তিতে তাঁর যে মূল্যায়ন হবে, সেটা হবে সত্যিকারভাবে নেতা হিসেবে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন।" গেল শতকের ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মরহুম ড. কবির স্যারের উপরিউক্ত ভাষণ এবং তৎপূর্বে ১৯৭৮ সালে বরিশালের কবি এ কে জয়নুল আবেদিন কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত 'মেমোরেবল স্পিস অব শের-ই-বাংলা' সংকলনের ভূমিকায় তাঁর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখক মহান নেতার বর্ণাঢ্য জীবন

ও কর্মের মূল্যায়নের যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে 'শের-ই-বাংলা : জীবন ও কর্ম'শীর্ষক গ্রন্থ তার একটি সংক্ষিপ্ত প্রয়াস।

১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল শের-ই-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুক হকের ইন্তিকাল হতে এ পর্যন্ত তাঁর জীবন ও কর্মভিত্তিক প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা যথেষ্ট না হলেও কম নয়। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, দু'একটি ব্যতীত অধিকাংশ বই 'আউট অফ মার্কেট'। কিছু বই ইতিহাসভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার পরিবর্তে আবেগতাড়িত ও কিচ্চা-কাহিনীসুলভ। যে কয়টা বই বাজারে পাওয়া যায় তার মধ্যে বরিশালের অন্যতম কৃতিসন্তান বিশিষ্ট আমলা, গ্রন্থকার ও গবেষক সিরাজ উদ্দিন আহমদের বইটি অনেকখানি সঠিক তথ্যভিত্তিক। বর্তমান লেখকের 'শের-ই-বাংলা: জীবন ও কর্ম' গ্রন্থটি মহান নেতার ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রণয়নে কতটা সফল, তা বিজ্ঞ পাঠকবর্গের সুবিবেচনার দাবি রাখে। অবশ্য ইদানীং অনেকের বড় বই পড়ার অনাগ্রহ দেখে সংক্ষেপে তা প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছি। সংক্ষিপ্ত হলেও আমাদের প্রিয় নেতার বর্ণাঢ্য জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সজ্ঞানে পরিত্যক্ত হয়নি বলে লেখকের প্রত্যয়।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি, গবেষক ও লোকবিজ্ঞানী ড. আশরাফ সিদ্দিকী নানা কর্মব্যস্ততার মাঝে বক্ষ্যমাণগ্রন্থ সম্পর্কে অভিমত লিখে দেওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করছি। বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম অধ্যক্ষ সিদ্দিকী (১৯২৭-২০২০) ইতিপূর্বে 'মেমোরেবল স্পিচেস অব শের-ই-বাংলা' গ্রন্থের সংকলক, মরহুম এ কে জয়নুল আবেদিন সাহেবকে (১৯২০-৮০) প্রত্যয়নপত্র দেওয়ায় এবং চাখার শের-ই-বাংলা স্মৃতি যাদুঘর পরিদর্শন পূর্বক চমৎকার মন্তব্য করার জন্য আমরা বরিশালবাসী তথা শের-ই-বাংলার ভক্তবৃন্দ তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখজনক যে, ২০০৭ সালে উল্লেখিত লেখার পরে ড. সিদ্দিকী অত্র গ্রন্থের প্রকাশনা দেখে যেতে পারেননি। বিশিষ্ট কলামিস্ট ও গবেষক, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ড. অবদুল লতিফ মাসুম অত্র গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নিছক ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিতে নয়, দেশ ও জাতির সামনে মহানায়কের সঠিক ইতিহাস পেশ করার মহৎ উদ্দেশ্যে একাডেমিক পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এম আবদুল আজিজ প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা ও মহান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, অত্র গ্রন্থের প্রকাশনা ও সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন ও মানোন্নয়নের প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

মাআ'স সালাম

মো. মোসলেম উদ্দীন শিকদার

'সালেহা মনজিল'
গৌরনদী, বরিশাল
৩০ ডিসেম্বর ২০২৩

সূচি

প্রথম ভাগ

(শের-ই-বাংলার জীবন ও কর্ম)

প্রাক্‌কথন	১৭
পূর্বপুরুষদের ইতিবৃত্ত	১৭
পিতামাতার পরিচিতি	২০
জন্ম ও শৈশব কাল	২২
প্রাথমিক শিক্ষা	২৩
স্কুল জীবন– বরিশাল জিলা স্কুল	২৪
উচ্চশিক্ষা: কলকাতায়	২৫
কর্মজীবন শুরু আইন ব্যবসায়	২৬
কলকাতা ছেড়ে পৈতৃক জেলা শহরে	২৭
বরিশালে বহুমুখী কর্মব্যস্ততা	২৮
কলকাতা জীবনের অভিজ্ঞতা – সমকালীন পরিস্থিতি ও মানসিক বিপ্লব	২৯
বঙ্গভঙ্গ ও মুসলিম লীগের জন্ম	৩০
সরকারি চাকরি গ্রহণ ও বর্জন	৩২
সক্রিয় রাজনীতিতে যেভাবে আবির্ভাব	৩৩
বঙ্গীয় আইন সভায়	৩৫
কৃষক প্রজা আন্দোলন	৩৬
বহুমুখী নেতৃত্ব ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব	৩৭
পার্লামেন্টে ও ময়দানে দুঃসাহসী মুজাহিদ	৩৯
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোকাবিলায়	৪৩
পারিবারিক জীবন	৪৪
ষড়যন্ত্রের কবলে হক রাজনীতি	৪৭
বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে	৪৮
কলকাতা করপোরেশনের মেয়র (১৯৩৫)	৫০
শের-ই-বাংলা খেতাব লাভ	৫১

স্যার নাজিম উদ্দিন ও পটুয়াখালীর পানিপথ- (১৯৩৭)	৫৩
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এ কে ফজলুল হক	৫৬
জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ – কৃষক প্রজার মুক্তি	৬১
শিক্ষা ক্ষেত্রে ফজলুল হকের অবদান	৬২
লাহোর প্রস্তাব ও ফজলুল হক	৬৩
হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ	৬৫
পঞ্চাশের মন্বন্তর ও ফজলুল হকের 'আজকের বাংলা'	৬৬
হক মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা ও বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আচার্য পিসি রায়	৬৭
মুসলিম রেনেসাঁর জনক	৬৯
হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত	৭০
নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ও শের-ই-বাংলা	৭২
সাহিত্য ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা	৭৪
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও দৈনিক নবযুগ	৭৬
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও শের-ই-বাংলা (১৮৬১-১৯৪১)	৭৯
মহাকবি স্যার মোহাম্মদ ইকবাল ও ফজলুল হক	৮১
সৈয়দ বদরুদ্দোজা ও এ কে ফজলুল হক (১৮৯৭-১৯৭৪)	৮২
হক-জিন্নাহ মতানৈক্য	৮৪
১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও মুসলিম লীগের জাগরণ	৮৭
স্বাধীন সার্বভৌম বৃহত্তর বাংলা আন্দোলন নস্যাৎ	৮৮
১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও ফজলুল হক	৯০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ফজলুল হক	৯৩
চাখার ফজলুল হক কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৯৪০)	৯৬
১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও সরকার গঠন	৯৮
মাতৃভাষার মর্যাদা দানে শের-ই-বাংলা	১০০
পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন	১০২
প্রথম বাঙালি গভর্নর এবং রাজনীতি থেকে বিদায়	১০৪
বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও শের-ই-বাংলা	১০৬
আদর্শ আইনজীবী	১০৯

সেরা বাগ্মী	১১১
দানবীর 'বাংলার হাতেম তাঈ'	১১৩
ধর্মানুরাগিতা : সাচ্চা মুসলিম	১১৫
অতুলনীয় জনপ্রিয়তা	১১৭
শেষ জীবন ও তিরোধান	১১৯
তিন নেতার মাজার	১২২
ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও কৃতিত্ব	১২৪
চাখারে শের-ই-বাংলা স্মৃতি জাদুঘর	১২৯

দ্বিতীয় ভাগ
(ঐতিহাসিক ভাষণ ও পত্রাদি)

ঐতিহাসিক ভাষণসমূহ (১ম-২২ পরিচ্ছেদ)	১৫১-২৭৯
ঐতিহাসিক পত্রাবলি (২৩-৩৫ পরিচ্ছেদ)	২৮১-৩২৮
পরিশিষ্ট-১	৩২৯
পরিশিষ্ট-২	৩৩১
পরিশিষ্ট-৩	৩৩৩
পরিশিষ্ট-৪	৩৩৫
পরিশিষ্ট-৫	৩৩৯

** দ্বিতীয় ভাগের শুরুতে শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের ঐতিহাসিক ভাষণ ও পত্রাবলির বিস্তারিত সূচি সংযোজিত হয়েছে।